

শিক্ষা, পরীক্ষা ও রাজনীতি

স হ জিয়া ক ড় চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ



শিক্ষা একজন মানুষকে শুধু যোগ্য ও বিচার-বিবেচনাশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে না, তাকে বিনম্র, মার্জিত ও রুচিশীলও করে। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠেন। কোনো খুশির ব্যাপারে কিংবা কোনো সাফল্যে একজন অশিক্ষিত-অমার্জিত মানুষ যেভাবে আবেগ ও আনন্দ-উল্লাসের প্রকাশ ঘটাবে, একজন শিক্ষিত মানুষের আনন্দের প্রকাশভঙ্গি হবে অন্য রকম।

ফুটবল খেলার শেষ মুহূর্তে একটি গোল করলে বিজয়ী দলের খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকদের উল্লাসের ধরন এক রকম। কোনো পরীক্ষায় ফল ভালো করে কৃতকার্য হওয়াতে যে নির্মল আনন্দ, তা একেবারেই অন্য জিনিস। দুই রকম আনন্দ প্রকাশের ধরন হবে দুই রকম। ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতায় যে গোল করে সে খুশিতে লাফ দিয়ে অন্য খেলোয়াড়ের কাছে উঠলে তা অশোভন নয়, বরং উপভোগ্য। কিন্তু পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে শুনেই সহপাঠীর ঘাড়ের উঠে উৎকট ভঙ্গি করা অতি দৃষ্টিকটু। অথবা কোমর দুলিয়ে খ্যামটা নাচের মতো নৃত্য শুরু করা মোটেই শোভন নয়। বিকৃত রুচির দৃষ্টান্ত।

শুনেছি আজকাল গণমাধ্যমের রসদ জোগাতে কোন উপলক্ষে কীভাবে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে হবে, তার রিহার্সেলও হয়ে থাকে। দামি ঝলমলে কাপড় পরলেই একজন সংস্কৃতিমান হয় না। আমাদের সমাজে এখন লক্ষ করা যাচ্ছে, সংস্কৃতিমান হওয়ার কিছু সহজ উপায় বেরিয়েছে। কলকাতার জোড়াসাঁকার স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলের রচিত ও সুরারোপিত কিছু গানের কলি আওড়ালেই নিজেকে সংস্কৃতিমান বলে প্রতীয়মান করা যায়। অথচ তার যে রয়েছে রাশি রাশি অমূল্য সাহিত্যিকর্ম, সেগুলো স্পর্শ করার প্রয়োজনও বোধ করে না।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী কতটা বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছে, তা পরিমাপের জন্য গ্রহণ করা হয় আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা। এশিয়া-ইউরোপের সব দেশেই তা হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিসেও ছিল, ইরান-ইরাকেরও ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল। আমাদের দেশে শত শত বছর আগে সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠীতে পড়ানো হতো বেদ-বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়-নব্য ন্যায় প্রভৃতি। কতিন ছিল সেসবের পরীক্ষাপদ্ধতি। যৌদ্ধবিহারে হতো গভীর জ্ঞানচর্চা। মাদ্রাসায় ইসলামি ধর্মতত্ত্ব শুধু নয়, বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতি চর্চা হতো, তা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার লিখে রেখে গেছেন। তারপর ইংরেজরা এসে যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন, প্রধানত তাঁদের সাহায্যকারী আমলা তৈরির উদ্দেশ্যে, সেখানেও তারা স্থাপন করলেন উচ্চ মান। সে মান এতই উচ্চ যে পরীক্ষায় পাস করতে ছাত্রের জান বেরিয়ে যেত। তাই প্রথম বছর এনট্রান্স পরীক্ষায় (এসএসসির সমপর্যায়) তেরোজনের মধ্যে পাস করেছিলেন মাত্র দুজন। ১৫ দশমিক ৫ শতাংশের কম। ওই পাসের হারে সেদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী (তাঁর পদবি যা-ই হোক), বাংলার গভর্নর বা ভারতবর্ষের ভাইসরয় বা গভর্নর জেনারেল মর্ম বেদনায় ভেঙে পড়েননি, যা স্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক হিসেবেই তাঁরা গ্রহণ করেন। কারণ, তখন শিক্ষা ও রাজনীতি আলাদা ছিল।

আমরা আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখার দাবি করি, কিন্তু শিক্ষাকে এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার কথা

একবারও বলি না। বেশি পাস করানোর উপযোগিতা একটাই, তা রাজনৈতিক। বেশি পাসের আনন্দ সরকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ছাত্রছাত্রী কী পড়াশোনা করল এবং কী পরীক্ষা দিল সেটা বড় কথা নয়, পাস করিয়ে দেওয়া হলো কি না, সেটাই প্রধান। হয়তো শিগগিরই ফেল বলে কোনো শব্দ বাংলাদেশের অভিধানে থাকবে না।

কয়েক দিন আগে মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকেই আনন্দ-বিষাদ ও সুখ-দুঃখের নানা খবর কাগজে আসছে। পিরোজপুরের ভারিয়ার উপজেলার এক ছাত্রী গত ৩০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গণিত পরীক্ষা দিতে পারেনি। ওই দিন 'প্রেমিকসহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে সে গণিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। পরের বছর শুধু গণিত বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করতে পারবে, এটা ভেবে বাকি পরীক্ষায় অংশ নেয় সে।' [সমকাল, ১৪ মে] ভাগ্যবিধাতা ও শিক্ষা বোর্ডের রহমতে সে 'জিপিএ-৪.০৬ পয়েন্ট পেয়েছে'। মেয়েটি একা নয়, তার মতো ভাগ্যবতী ও ভাগ্যবান আজ বাংলার মাটিতে অগণিত। ধারণা করি, প্রেমের মতো অতি মহৎ জিনিস করার পরেও হৃদয়হীন পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় শিক্ষা বোর্ডের সুযোগ্য ও নীতিমান পরীক্ষকের হৃদয়ে করুণার উদ্বেগ হয়েছে। যে ছেলে বা মেয়ে পড়া ও প্রেম একসঙ্গে চালাতে পারে, সে পরীক্ষায় কম নম্বর পেলেও প্রেমের জন্য সর্বোচ্চ নম্বরই তার প্রাপ্য। সে যে গোপ্তেন জিপিএ ফাইভ পায়নি, এতেই অনেকে বিস্মিত। এ জন্যই গতবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন এক টিভি চ্যানেলের প্রণেত্র জবাবে আমি বলেছিলাম, ২০২১ নাগাদ পরীক্ষার্থীদের মা-বাবাদের অনেকে জিপিএ-৫ পাবেন।

আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেওয়া ভালো, ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া ক্ষুধার্তকে ভালো, দীর্ঘরাত্রে প্রাণি-পক্ষী-পশু-পাখি খুব ভালো, অক্ষম-অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা

করা অবশ্যই ভালো। করুণা জিনিসটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় গুণ হিসেবেই গণ্য। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীকে প্রাপ্যের বেশি নম্বর দেওয়া মহৎ গুণ তো নয়ই, খুব বড় অনায়াস। এবং যে ছাত্রছাত্রী ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করেনি, তাকে যোগ্যতার সনদ দেওয়া ঘোরতর অনায়াস।

পাস জিনিসটি কী এবং ফেল মানুষ কেন করে, তা সম্পর্কে সব দেশের সব যুগের মানুষের ধারণা নেই। বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাতেই প্রথম খারাপ করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা যাকে ফেল বলি, তা-ই করে থাকতেন, যার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না। কুড়ি শতকের ফরাসি দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্রে, বিরাট মেধার অধিকারী, স্নাতক পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করেন। তাঁর বান্ধবী সিমন্ দ্য ব্রুয়ার ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে যান। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সফল ব্যক্তি পরীক্ষায় ভালো করেননি এবং কোনো না কোনো সময় ফেল পর্যন্ত করেছেন। তাতে তাঁদের কী হয়েছে? কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁরা ফেলটা করেছেন অতি উচ্চ মানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষার্থী হিসেবে। মানহীন শিক্ষাব্যবস্থায় পাসই কী আর ফেলই কী? খার্ড ডিভিশনই কী আর গোপ্তেন জিপিএ ফাইভ কী?

যুগের প্রয়োজনে শিক্ষা কার্যক্রমে ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়। ৫০-৬০ বছর আগে বাণিজ্য অনুষদের কোনো বিষয়ে স্নাতক মাস্টার্স করলেই কাজ চলে যেত। এখন বিবিএ, এমবিএ ছাড়া চলে না। ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার সময় কম্পিউটার ছিল না বলে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। সময়ের প্রয়োজনে নতুন বিষয় পঠিত হবে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থহীন ও খামখেয়ালি পরিবর্তন আনা চরম আত্মঘাতী।

শিশুদের কাছে পরীক্ষা শব্দটিই একটি ভীতির বিষয়। কোনোরকমে পরীক্ষা এড়াতে পারলে বাচ্চারা অপার আনন্দ ভোগ করে। চারদলীয় জোটের সরকারের সময় এক সন্ধ্যায় এক বাড়িতে বসে ছিলাম। টেলিভিশনের স্ক্রলে পরের দিন হরতালের ঘোষণায় দুটি বাচ্চাকে দেখা গেল মহাখুশি। ওদের মাকে বললাম, ওরা কি ১৪ দলীয় জোটের সমর্থক? তিনি বললেন, কাল ওদের একটা পরীক্ষা আছে। স্কুলে যেতে হবে না, তাই খুশি।

শিশুদের কাছে পরীক্ষা একটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণিকক্ষে সাপ্তাহিক পরীক্ষাই ওদের কাছে বিরক্তির মতো মনে হয়। তার মধ্যে দেশসুখ ঘট করে এক দিনে সব ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হওয়া অশেষ যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে কম কষ্টকর নয়। এই পদ্ধতির যাঁরা উদ্ভাবক, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার তাঁরা কী উপকার করেছেন, তা উপলব্ধি করার সাধ্য আমাদের মতো মানুষের নেই। এতে যন্ত্রণা শুধু শিক্ষার্থীর নয়, তাদের অভিভাবকদেরই বেশি। এ ব্যবস্থায় দুঃখপোষ্য শিশুদের মাঝায় যে শুধু হাড়ডি পেটানো হচ্ছে তা-ই নয়, রাষ্ট্রের বিপুল অর্থের হচ্ছে অপচয়।

এ বছর ১৪ লাখ ৫২ হাজার ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করেছে। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ১১ হাজার মেয়ে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। গত মার্চ-এপ্রিলে বিভিন্ন জেলায় অনেক স্কুলে আমি গিয়েছি বিভিন্ন উপলক্ষে। ২৬ মার্চ সকালে জিলাম নওগাঁ জেলার একেবারে সীমান্তবর্তী আগ্রা-দ্বিগুণ ইউনিয়নে। আধা কিলোমিটারের মধ্যে কয়েকটি স্কুল। আগ্রা-দ্বিগুণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, আগ্রা-দ্বিগুণ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আগ্রা-দ্বিগুণ কিতারগার্টেন স্কুল, আগ্রা-দ্বিগুণ সংগীত একাডেমির শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রা বের করে। শত শত মেয়ে। ১০০ বছর আগে বেগম রোকেয়া যতটা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওদের অর্জন তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। বহুদিন আগে আমাদের কবির বাংলার স্নেহময়ী নারীদের দেখে 'মা বলিতে প্রাণ আনচান' করে তাঁর 'চোখে জল এসেছিল ভরে'। একালের আমাদের মা-দের দেখে আমারও চোখে পানি আসার উপক্রম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের অগ্রযাত্রার দৃশ্য বাংলার যে জনপদে গৃহি সবখানেই দেখেছি। কিন্তু আমরা কি তাদের মানসম্মত শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারছি? তা না পারলে শিক্ষার হার বাড়বে, পিছিয়ে থাকবে বিশ্ব থেকে।

প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে বই-উৎসব, খাতা-উৎসব, পরীক্ষা-পার্বণ প্রভৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। খাদ্য মানেই পুষ্টির সুখাদ্য, শিক্ষাও তাই, মানসম্মত সুশিক্ষা। নিম্নমানের শিক্ষায় ড. খুদার মতো বিজ্ঞানী হবে না, আখতার হামিদ খানের মতো প্রশাসক হবে না, ডাক্তার ইব্রাহিমের মতো চিকিৎসক হবে না, বরং মোটামুটি ভালো প্রকৌশলী, স্থপতি, কৃষিবিদ—টেকসই উন্নয়নের জন্য যাদের খুবই প্রয়োজন—তাও হবে না। এমনকি যে কাজে সবচেয়ে কম বিদ্যা লাগে, সেই পাঠ্যযোগ্য কলামের লেখকও পাওয়া দুস্কর হবে। আর কোনো কিছুই না হোক, চিন্তাশীল মানুষ এবং মানবিক গুণসম্পন্ন চরিত্রবান মানুষও যে হবে না, তাতে সন্দেহ কী? উন্নত শিল্প-সংস্কৃতিও হবে না। এই শিক্ষা থেকেই একুশের বইমেলায় কবি তাঁর ১৮তম কাব্যগ্রন্থে লেখেন, 'আকাশে ঘাসের নদী যেউ যেউ করে'। এর অর্থ কী জানতে চাইলে সন্ধ্যা জবাব: আকাশ কী, ঘাস কী, নদী কী, যেউ যেউ করা সারমেয় কী, তাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক, তা বুঝে নাও হে বাংলার বে-আক্কেল মানুষ।

সুতরাং আক্কেলমন্দ—উন্নত জাতি গঠনে

মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই।

● সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।